بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমুআ

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সাদাসিধে এবং অনাড়ম্বর জীবনযাপনের কিছু দৃষ্টান্ত ও রেওয়ায়েত বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ৩০ অক্টোবর, ২০২৬ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমুআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর অত্যন্ত সাদাসিধে জীবনযাপন ও সরল জীবনধারা সম্পর্কিত আলোচনা চলছিল। গত সপ্তাহে এই প্রসঙ্গে তাঁর খাওয়া-দাওয়ায় অনাড়ম্বর ভাব, আহার গ্রহণের পদ্ধতি এবং তাঁর সামগ্রিক জীবনযাত্রার মান ও মাপকাঠি কেমন ছিল, সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছিল। আজও এই সম্পর্কিত বর্ণনা অব্যাহত থাকবে।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) এর প্রতিটি কাজ ও আচরণে এক অনন্য সরলতা এবং কৃত্রিমতাহীনতার চমৎকার রং ফুটে উঠত। যারা উপাদেয় ও বিলাসবহুল আহারের অভ্যস্ত, তারা হয়তো এটাই মনে করেন যে, মহানবী (সা.) নিশ্চয়ই সুস্বাদু ও উন্নতমানের খাবার খেতেন এবং তাঁর সামনে রাজকীয় ও জাঁকজমকপূর্ণ দস্তরখান বিছানো হতো; কিন্তু তারা এ বাস্তব সত্য জেনে বিস্মিত হবেন যে, প্রকৃত ঘটনা এর সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। এক দিক দিয়ে যেমন মহানবী (সা.) ছিলেন পরম সাদাসিধে জীবনের পূর্ণাঙ্গ আদর্শ ও নমুনা, তেমনি অন্যদিকে এই অত্যন্ত সরল ও অনাড়ম্বর জীবনের ক্ষেত্রেও তিনি ছিলেন সমগ্র বিশ্বের জন্য এক অনুপম অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত।

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, হযরত আয়েশা (রা.) তাঁর ভাগ্নে উরওয়াকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন: হে আমার ভাগ্নে! আমরা নতুন চাঁদ দেখতে দেখতে পর্যায়ক্রমে তিনটি চাঁদ অবলোকন করে ফেলতাম-অর্থাৎ, দীর্ঘ দুই মাস অতিবাহিত হয়ে যেত, অথচ রসূলুল্লাহ (সা.) এর পবিত্র পরিবারে (রান্না করার জন্য) চুলায় কোনো আগুন জ্বলত না। প্রশ্নকারী তখন জিজ্ঞাসা করলেন, তবে আপনারা কী খেয়ে দিনাতিপাত করতেন? হযরত আয়েশা (রা.) উত্তর দিলেন: আমরা কেবল পানি ও খেজুর খেয়ে জীবন ধারণ করতাম; আর আমাদের আনসারি প্রতিবেশীরা তাঁদের পালিত বকরির দুধ আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন।

আল্লাহ আল্লাহ! কী এক পবিত্র ও সাদাসিধে জীবনযাপন ছিল যে, দীর্ঘ দুই মাস ধরে (রান্না করার জন্য) চুলায় কোনো আগুনই জ্বলত না এবং কেবল খেজুর, পানি ও দুধের ওপরই জীবনযাপন নির্বাহ হতো! ইতিহাসের এই সুমহান আদর্শ অবলোকন করে আজ আমাদের মুসলিম সমাজের লজ্জা পাওয়া উচিত। আজকাল মুসলমানদের মধ্যেও কিছু বিত্তশালী ও সম্পদশালী ব্যক্তি এমন রয়েছেন, যারা এই পানাহার ও উপাদেয় খাদ্য গ্রহণের ব্যাধিতে তীব্রভাবে আক্রান্ত। তাদের দেখাদেখি অপেক্ষাকৃত কম সচ্ছল ও সাধারণ আয়ের মানুষেরাও লোকদেখানোর জন্য অতিরিক্ত ব্যয় করতে এবং সাধ্যের বাইরে খরচ করতে উদ্বুদ্ধ হয়। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেছেন যে, মুসলমানদের অর্জিত অর্থ-সম্পদের সিংহভাগই কেবল উন্নতমানের পানাহার ও খাদ্যসামগ্রীর পেছনে অপব্যয় হয়ে যায়, যার ফলে তারা সারাজীবন ঋণের বোঝায় জর্জরিত ও ঋণী হয়ে থাকে।

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আজকাল মানুষের পক্ষ থেকে এই দাবি খুব বেশি দেখা যায় যে, আমাদের খাওয়া-দাওয়ার মান ও স্ট্যাটাস ভালো নয়; অথচ মানুষের যে আয় বা উপার্জনই হোক না কেন, তার মধ্যেই সন্তুষ্ট থেকে জীবনযাপন করা উচিত। হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, মহানবী (সা.) যদি এক দিক দিয়ে চরম সাদাসিধে জীবনের এক অনন্য আদর্শ ছিলেন, তবে অন্যদিকে তিনি 'বৈরাগ্যবাদ'-কেও কঠোরভাবে অপছন্দ করতেন। যদি তাঁর সামনে উৎকৃষ্ট থেকে উৎকৃষ্টতর খাবারও পেশ করা হতো, তবে তিনি তা সানন্দে গ্রহণ করতেন। এমনটি ছিল না যে, কোনো কৃত্রিম আত্মপীড়নের খাতিরে তিনি তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন বা অস্বীকার করতেন। এই ভারসাম্যপূর্ণ ও অনন্য গুণই তাঁকে অন্যান্য সমস্ত মানুষের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা দান করেছিল; কারণ তিনি এসেছিলেন সমগ্র বিশ্বের মানবজাতির জন্য এক সর্বজনীন রহমত হিসেবে, কেবল কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা সীমিত

সম্প্রদায়ের জন্য নয়। তাই তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতিটি দিক দিয়ে পরিপূর্ণ ও ভারসাম্যপূর্ণ হওয়া ছিল অপরিহার্য। একদিকে যেমন তিনি সাদাসিধে জীবনযাপনের ক্ষেত্রে চূড়া স্পর্শ করেছিলেন, অন্যদিকে তেমনি উন্নত ও পবিত্র খাদ্যসামগ্রী ব্যবহারের ক্ষেত্রেও তিনি কোনো কৃচ্ছ্রসাধন বা বাড়াবাড়ি করতেন না। তবে হ্যাঁ, তাঁর স্বাভাবিক ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সাধারণত অত্যন্ত অনাড়ম্বর ও সরলই থাকত এবং তিনি কেবল এই উদ্দেশ্যেই আহার গ্রহণ করতেন-যাতে জীবনের ধারাবাহিকতা বজায় থাকে এবং আল্লাহর ইবাদত ও জনসেবার কাজের জন্য শরীরে পর্যাপ্ত শক্তি ও সামর্থ্য অটুট থাকে।

মহানবী (সা.) নিজ জীবনে এই অনন্য আদর্শও স্থাপন করে গেছেন যে, একদিকে তিনি সব ধরনের উৎকৃষ্ট ও উন্নতমানের খাদ্যসামগ্রীও ব্যবহার করেছেন, আর অন্যদিকে নিজের চরম সাদাসিধে ও অনাড়ম্বর জীবনযাপনের মাধ্যমে আমাদের সমাজের বিত্তশালী ও অভিজাতশ্রেণির জন্য এক অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন-যাদের জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্যই কেবল উপাদেয় খাদ্য আর জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরিধান করা।

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, ভালো ও সুস্বাদু খাবার আহার করা প্রসঙ্গে একটি ঐতিহাসিক বর্ণনা রয়েছে-একবার মহানবী (সা.) ছাগলের রানের গোশত আহার করছিলেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন যে, মহানবী (সা.) ছুরি দিয়ে গোশত কেটে তা আহার করেছিলেন; আর তিনি এই পদ্ধতিটি এজন্য অবলম্বন করেছিলেন যাতে উম্মতের জন্য (খাবারের শিষ্টাচার ও সহজতা পালনে) কোনো প্রকার কষ্ট বা অসুবিধে না হয়।

শরীয়তসম্মত জায়েজ ও বৈধ প্রয়োজন অনুযায়ী এ ধরনের উন্নত খাবার খাওয়া সম্পূর্ণ জায়েজ; কিন্তু এর সাথে নিজেকে একান্তভাবে জড়িয়ে ফেলা, কৃত্রিম লৌকিকতা ও আড়ম্বর করা এবং এর বাইরে অন্য সাধারণ উপায় বা পদ্ধতিগুলোকে তুচ্ছ কিংবা অবমূল্যায়ন করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। মানুষ যদি অন্ধভাবে অন্যান্য জাতি বা সংস্কৃতির অন্ধানুকরণ করতে শুরু করে, তবে পরিণামে সে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার সুমহান আদর্শ থেকেও দূরে সরে যায়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) অনেক সময় নানাবিধ দাপ্তরিক কাজ বা লেখালেখির ব্যস্ততার মাঝে (লেখার টেবিলে বা) মেজের ওপর বসেও খাবার খেয়ে নিতেন; আবার কখনো সাধারণ নিয়মে মাটিতে বসেও খাবার গ্রহণ করতেন।

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, মহানবী (সা.) এর বিবাহ ও ওলিমা সম্পর্কে একটি ঐতিহাসিক বর্ণনা এভাবে পাওয়া যায় যে, মহানবী (সা.) হযরত সাফিয়া (রা.)-কে মুক্ত করে দেন এবং এরপর তাঁকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন। তাঁকে (দাসত্ব থেকে) মুক্তি দেওয়াই ছিল তাঁর মোহর। এই সফরকালেই মহানবী (সা.) সকালবেলা (খাওয়ার জন্য) দস্তরখান বিছিয়ে দিলেন এবং উপস্থিত সকলকে বললেন, যার কাছে যা কিছু আছে, তা-ই নিয়ে এসো। তখন কেউ খেজুর নিয়ে এলেন, কেউ ঘি এবং কেউ ছাতু। এরপর সে সমস্ত সামগ্রী একত্র করে একসঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হলো-আর এটিই ছিল মহানবী (সা.) এর ওলিমা।

হুযূর আনোয়ার (আই.) আরও বলেন, ছোট-বড় সবার দাওয়াতই তিনি (সা.) পরম স্নেহে কবুল করতেন। হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন যে, এক দর্জি মহানবী (সা.)-কে (খাবারের জন্য) আমন্ত্রণ জানান। তিনি বলেন, আমিও মহানবী (সা.) এর সাথে সেই দাওয়াতে গিয়েছিলাম। সেই দর্জি মহানবী (সা.) এর খেদমতে জব বা বার্লির রুটি এবং ঝোল পেশ করেন, যাতে লাউ এবং শুকনো গোশতের টুকরো ছিল। হযরত আনাস (রা.) বলেন, আমি দেখলাম যে, রসূলুল্লাহ (সা.) পরম আগ্রহের সাথে পেয়ালার চারপাশ থেকে লাউয়ের টুকরোগুলো বেছে বেছে খাচ্ছেন। সেদিন থেকেই আমিও লাউ অত্যন্ত পছন্দ করতে শুরু করেছি।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন, লাউ (কদু) মহানবী (সা.) এর অত্যন্ত পছন্দনীয় ও প্রিয় খাবার ছিল। আবার এমন সময়ও তাঁর জীবনে এসেছে, যখন দুবেলা দুমুঠো খাবারটুকুও তাঁর নসিব হয়নি। অতএব, যে ব্যক্তি অজ্ঞতাবশত এ কথা বলে যে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.) কেন উন্নত মানের গোশত আহার করলেন, কিংবা কেন উৎকৃষ্ট ও রাজকীয় শরবত পান করলেন এবং কেন উন্নতমানের খাবার খেলেন-সে মূলত চরম বোকামির পরিচয় দেয়। কারণ সে এই বিষয়টি মোটেও বিবেচনা করে না যে, মহানবী (সা.)-কে দীর্ঘ অনাহার -এর কষ্টও সহ্য করতে হয়েছে এবং তীব্র ক্ষুধার যাতনা থেকে বাঁচার জন্য পেটে পাথর বা কাপড়ের পটি বাঁধতে হয়েছে।

এমন দুর্দিনও তাঁর ওপর এসেছে-যখন এক দরিদ্র নারী তাঁর পবিত্র গৃহে কিছু সাহায্য বা ভিক্ষা চাওয়ার জন্য এল; তখন হযরত আয়েশা (রা.) বলেন যে, সেদিন আমাদের ঘরে আহারের জন্য সামান্যতম কোনো কিছুও ছিল না এবং অনেক খোঁজাখুঁজির পর একটি মাত্র খেজুর পাওয়া গেল। তখন সেই নারী খেজুরটিকে দুটি টুকরো করে তার দুই কন্যাকে খাইয়ে দিল। হযরত আয়েশা (রা.) মহানবী (সা.) এর কাছে এই ঘটনার উল্লেখ করলেন। তখন নবী করীম (সা.) বললেন: কারও ঘরে যদি দুটি কন্যাসন্তান থাকে এবং সে যদি তাদের উত্তমরূপে লালন-পালন ও দেখাশোনা করে, তবে আল্লাহ তা'লা তার ওপর জান্নাত অবধারিত ও ওয়াজিব করে দেন।

হুযূর আনোয়ার (আই.) আরও বলেন, যখনই কেউ মহানবী (সা.) এর সীরাত ও পবিত্র জীবন চরিত শ্রবণ বা পাঠ করেন, তখন তাতে বর্ণিত প্রতিটি ঘটনার মাঝে মানুষের নৈতিক প্রশিক্ষণ, অশেষ প্রজ্ঞা এবং সদুপদেশের বহুবিধ দিক স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে-আর ঠিক এই চমৎকার শিক্ষাটিই আমরা এই বর্ণনার মাঝে দেখতে পাই।

হুযূর আনোয়ার (আই.) আরও বলেন, 'দীবাচা তাফসীরুল কুরআন'-এ হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) মহানবী (সা.) এর

পবিত্র সীরাত বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন যে, খাওয়া-দাওয়ার বিষয়ে মহানবী (সা.) সর্বদা চরম সাদাসিধে ভাব বজায় রাখতেন। খাবারে কখনো লবণের পরিমাণ বেড়ে গেলে, কিংবা লবণ না থাকলে, কিংবা খাবার রান্না খারাপ বা উপাদেয় না হলে তিনি কখনো কোনো ধরনের অসন্তোষ বা বিরক্তি প্রকাশ করতেন না। যতদূর সম্ভব হতো, সেই খাবারই খেয়ে নিতেন-যাতে খাবার রান্না ব্যক্তির মন ভেঙে না যায় এবং তিনি কোনোভাবে অন্তরে আঘাত বা কষ্ট না পান। কোনো খাবার যদি তাঁর পছন্দ না হতো, তবে তিনি হাত গুটিয়ে নিতেন (খাওয়া থেকে বিরত থাকতেন); কিন্তু মুখে তা প্রকাশ করতেন না এবং দোষত্রুটি ধরতেন না। কোনো উপঢৌকন বা খাদ্যদ্রব্য এলে তা নিজের কাছে জমা করে না রেখে সাহাবিদের মাঝে সমানভাবে বণ্টন করে নিজে তা থেকে খেতেন। একবার কিছু খেজুর আসার পর তিনি সাহাবিদের মাঝে গুণে গুণে প্রত্যেককে সাতটি করে খেজুর বিতরণ করেছিলেন।

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন যে, আমি কখনো মহানবী (সা.) কে কাউকে গালমন্দ বা অকথ্য ভাষা ব্যবহার করতে দেখিনি; আর তাঁর কোনো কাপড় কখনো ভাঁজ করে তুলে রাখতে হয়নি। অর্থাৎ, তাঁর নিত্যদিনের পরিধানের কাপড় বলতে মাত্র একটি জোড়াই থাকত-দ্বিতীয় কোনো অতিরিক্ত জোড়া কাপড় ছিল না যা ভাঁজ করে গুছিয়ে রাখা হবে। কখনো কাপড় ধোয়ার প্রয়োজন দেখা দিলে তিনি তা ধুয়ে আবার সেভাবেই গায়ে জড়িয়ে বাইরে যেতেন, এমনকি কাপড়ে ভেজা পানির সামান্য চিহ্নও তখন বাইরে থেকে দেখা যেত।

এটি হলো সাদাসিধে জীবনের সেই অতুলনীয় ও সুমহান আদর্শ-যা কোনো বিত্তশালী বা সামর্থ্যবান ব্যক্তি জীবনে কখনো দেখাতে পারেননি এবং ভবিষ্যতেও কেউ দেখাতে পারবেন না।

হযরত ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত উমর (রা.) আতারেদ তামীমীকে বাজারে একটি ডোরাকাটা রেশমি কাপড় বিক্রি করতে দেখলেন। সেই ব্যক্তি সাধারণত (পারস্য বা রোমের) সম্রাট ও রাজাদের দরবারে যাতায়াত করে সেখান থেকে বড় বড় ইনাম ও পুরস্কার অর্জন করত। এ দৃশ্য দেখে হযরত উমর (রা.) নিবেদন করলেন: হে আল্লাহর রসূল (সা.)! আমি আতারেদকে এ ধরনের একটি সুন্দর কাপড় বিক্রি করতে দেখেছি; যদি কোনো প্রতিনিধিদল বা বৈদেশিক মেহমান আপনার দরবারে উপস্থিত হয়, তবে আপনি যদি এই কাপড়টি পরিধান করেন, তবে এর একটি সুপ্রভাব পড়বে অথবা আপনি জুমুআর দিনে এটি পরিধান করতে পারেন। উত্তরে মহানবী (সা.) বলেন: এই পার্থিব জগতে রেশমি কাপড় কেবল তারাই পরিধান করে, আখেরাতে যাদের কোনো অংশ বা পুণ্য নেই।

এই সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করার পর হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) এই অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন যে, পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে মহানবী (সা.) এতটাই চরম সাদাসিধে জীবন যাপন করতেন যে, বাস্তবিকপক্ষেই তাঁর এই অবস্থা ও দিনাতিপাতের বিবরণগুলো যখন আমি পাঠ করি, তখন আমার নিজের জীবন নিয়ে এক প্রকার লজ্জা অনুভূত হয়। যদিও বর্তমান যুগের পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও জীবনযাত্রার মান সম্পূর্ণ বদলে গেছে, তবুও এই পবিত্র ঘটনাগুলো পাঠ করলে মানুষের মনে এক গভীর লজ্জাবোধ ও আত্মোপলব্ধি জাগরিত হয়। পোশাক-পরিচ্ছদের বাহ্যিক তারতম্য ও বর্তমান যুগের পরিবর্তনকে যদি বাদও দেওয়া হয়, তবুও এ কথা অনস্বীকার্য যে, মহানবী (সা.) এর ব্যক্তিগত জীবন ছিল অত্যন্ত সাদাসিধে ও অনাড়ম্বর; আর এই অনুপম ত্যাগের আদর্শ ছাড়া মানবজাতির প্রকৃত প্রগতি ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ উন্মুক্ত হতে পারে না।

হযরত সামুরা বিন জুন্দুব (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, মহানবী (সা.) বলেছেন: তোমরা সাদা রঙের কাপড় পরিধান করো; কারণ এটি সর্বাধিক পবিত্র, পরিচ্ছন্ন এবং উৎকৃষ্টতম পোশাক; আর মৃত্যুর পর তোমাদের মৃত ব্যক্তিদেরও এই সাদা কাপড় দ্বারাই কাফন পরাও।

এক বর্ণনায় এসেছে যে, মহানবী (সা.) বলেছেন: মানুষ উদর বা পেট অপেক্ষা এমন কোনো মন্দ বা ক্ষতিকর পাত্র পূর্ণ করেনি, যা স্বাস্থ্যের জন্য এত হানিকর। আদম সন্তানের পিঠকে সোজা ও সচল রাখার জন্য মাত্র কয়েকটি লোকমা বা গ্রাসই যথেষ্ট। অর্থাৎ, পেটও একটি পাত্রের ন্যায়; যদি তোমরা এটিকে কেবল খাবার দিয়ে পূর্ণ করতেই থাকো, তবে এর পরিণামে কেবল শারীরিক অসুস্থতা ও পচনই সৃষ্টি হতে থাকবে। অতঃপর তিনি বলেন: এক-তৃতীয়াংশ খাবারের জন্য রাখো, এক-তৃতীয়াংশ পানির জন্য এবং বাকি এক-তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাস ও বাতাস চলাচলের জন্য নির্দিষ্ট রাখো। অর্থাৎ, সর্বদা কিছুটা ক্ষুধা অবশিষ্ট রেখেই আহার করো।

পেটের পীড়া বা পরিপাকতন্ত্রের সমস্যায় আক্রান্ত রোগীদের আধুনিক যুগের চিকিৎসকরা ঠিক আজ থেকে চৌদ্দ শ বছর পূর্বে মহানবী (সা.) যে পরামর্শ দিয়ে গেছেন, চিকিৎসাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আজ তারাও ঠিক একই পরামর্শই প্রদান করে থাকেন। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) বলেন যে, সাদাসিধে ও অনাড়ম্বর জীবনযাপনের ফলে মানুষের মধ্যে এমন এক সহনশীলতা তৈরি হয় যে, তারা জীবনের যেকোনো কঠিন কষ্ট ও সংকট সহজে সহ্য করতে পারে এবং দুঃখ-কষ্টময় দিনগুলো অতিবাহিত হলেও তাদের মনে কষ্ট বা আক্ষেপের কোনো অনুভূতিই জাগে না। যেমনটি আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ইউরোপের উন্নত দেশগুলোর মানুষেরা সামান্য যে বিষয়গুলোকে অত্যন্ত বড় সংকট ও দুর্ভোগ বলে মনে করে, সেগুলোর চেয়েও কঠিন অবস্থা

আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ অভ্যাসের অংশ। তারা যেগুলোকে বড় বড় বিপর্যয় ও মুসিবত বলে কল্পনা করে, আমাদের কাছে সেগুলো নিতান্তই স্বাভাবিক ও আরামদায়ক বিষয়। আর সে কারণেই এই ধরনের কষ্ট ও প্রতিকূলতাগুলো আমাদের অনুভূতিতেই আঘাত হানতে পারে না।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) আরও উল্লেখ করেছেন যে, কিছুদিন পূর্বে কেউ কেউ আমার কাছে এই বলে অভিযোগ করেছিলেন যে, (দুর্লভতার কারণে) নতুন কাপড় পাওয়া অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে; অথচ একজন প্রকৃত মোমেনের অবস্থা তো এই হওয়া উচিত যে, নতুন কাপড় জুটলে তা পরিধান করে নেবে, আর যদি না জোটে তবে পুরোনো পোশাকেই তালি লাগিয়ে সাদাসিধেভাবে জীবন কাটিয়ে দেবে। স্মরণ রাখা উচিত যে, স্বয়ং মহানবী (সা.) এর পবিত্র পোশাকেও তালি লাগানো থাকত! তবে কি আমরা তাঁর চেয়েও বড় কেউ হয়ে গেছি যে, আমরা আমাদের পোশাকে তালি লাগিয়ে পরিধান করতে দ্বিধাবোধ করব?

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, বর্তমান বিশ্বের সংকটময় পরিস্থিতিতে সর্বত্র কেবল এই হাহাকার ও শোরগোল শোনা যাচ্ছে যে, অমুক জিনিস পাওয়া যাচ্ছে না, তমুক বস্তু অমিল ইত্যাদি; আর যদি সত্যি সত্যি কোনো বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়, তবে না জানি পরিস্থিতি আরও কতখানি ভয়াবহ ও শোচনীয় রূপ ধারণ করবে। আমি ইতিপূর্বেও বহুবার এ কথা স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছি যে, বিশ্বজুড়ে যুদ্ধাবস্থা ও সংঘাতের পরিস্থিতি দিন দিন ক্রমেই ঘনীভূত হয়ে চলেছে। আর যদি অদূর ভবিষ্যতে আরও বড় ধরনের কোনো বিশ্বযুদ্ধ বেধে যায়, তবে কেবল ইউরোপই নয়, বরং সমগ্র বিশ্বকেই খাদ্য সংকট ও তীব্র অনাহারের এক অত্যন্ত কঠিন ও দুর্বিষহ সময়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হবে।

হযরত মুসলেহ মাওউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু অতীতে (তৎকালীন ভারতের) উদাহরণ দিয়ে এ কথা বুঝিয়েছিলেন যে, আজ আফ্রিকা এবং অন্যান্য স্বল্পউন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর মানুষের অবস্থা তো এই যে, তারা যদি কোনোমতে কেবল সামান্য একবেলা সাদাসিধে খাবারও পেয়ে যায়, তাতেই তারা অসীম সন্তুষ্টি প্রকাশ করে এবং পরম আনন্দে দিন কাটিয়ে দেয়। এই সমস্ত অঞ্চলের সাধারণ মানুষেরা যেকোনো কঠিন যুদ্ধ ও চরম প্রতিকূল পরিস্থিতিও সহজে সহ্য করে নিতে পারবে; কিন্তু ইউরোপ এবং উন্নত বিশ্বের দেশগুলো এই ধরনের চরম সংকট ও খাদ্যাভাব কখনো সহ্য করতে পারবে না, আর এই শোচনীয় পরিস্থিতিই তাদের মানসিকভাবে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত ও দিশেহারা করে তুলবে।

অতএব, আমাদেরও উচিত সর্বদা নিজেদের বর্তমান অবস্থা ও জীবনযাত্রার আত্মসমালোচনা করা, নিজেদের মধ্যে 'কানাআত' (অর্থাৎ অল্পে তুষ্টি) ও সন্তুষ্টির গুণ অর্জন করা এবং যথাসম্ভব অত্যন্ত সাদাসিধে ও অনাড়ম্বর জীবনযাপন করার আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। আমাদের সামনে সর্বদা মহানবী (সা.) এর পবিত্র আদর্শ এবং তাঁর সেই যুগকে স্মরণে রাখতে হবে। যদি ভালো ও উন্নতমানের খাবার কখনো সহজলভ্য হয়, তবে তা আহার করায় কোনো দোষ নেই; যদি উৎকৃষ্ট পোশাক-পরিচ্ছদ সম্ভব হয়, তবে তা পরিধান করায়ও কোনো মানা নেই। কিন্তু সেগুলোর ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়া এবং কোনো কারণে যদি তা না পাওয়া যায়, তবে 'আমরা তো ধ্বংস হয়ে গেলাম বা মারা গেলাম'-বলে মাতম করা ও হৈচৈ করা সম্পূর্ণ ভুল ও অনুচিত একটি মানসিকতা।

যাই হোক, আমাদের এই দোয়াও নিয়মিত করা উচিত যেন আল্লাহ তা'লা সমগ্র বিশ্বকে এই মারাত্মক বিপদ ও সর্বগ্রাসী বিপর্যয় থেকে হেফাজত করেন। বর্তমান বিশ্বের মোড়লেরা কেবল নিজেদের সংকীর্ণ অহমিকা ও অন্ধ স্বার্থপরতার কারণে নিজেদের ধ্বংসের গভীর খাদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। যদি বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতি ও সংঘাতময় ধারা এভাবেই চলতে থাকে, তবে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হওয়া একপ্রকার নিশ্চিত এবং এর পরিণামে তাদের বিশ্বব্যাপী ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের শিকার হওয়াও অনিবার্য। অন্যান্য দেশের সম্পদ ও ভূখণ্ডের ওপর অন্যায়ভাবে জবরদস্তিমূলক দখল বজায় রাখার অপচেষ্টা করার চেয়ে এই শক্তিগুলোর মূল দায়িত্ব হলো নিজেদের দেশের সাধারণ নাগরিক ও জনগণের প্রকৃত সেবা ও কল্যাণ সাধন করা। আল্লাহ তা'লা আমাদের সকলকেই সততা, খোদাভীতি ও সৎকর্মের ওপর দৃঢ়পদ থাকার তাওফিক দান করুন।

আল্‌হামদুলিল্লাহি নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)